Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 165 –174
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

কবির উপন্যাসে কবিতার প্রভাব - 'সেইসব শেয়ালেরা', 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' ও 'প্রেতপুরুষ'

THE IMPACT OF POETRY ON THE NOVEL: 'SEISHOB SHEYALERA', 'SANJHBATIR RUPKATHARA', 'PRETPURUSH'

সায়ন্তন বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sayantanbsws4@gmail.com

Keyword
IMPACT, POETRY, NOVEL, SEISHOB SHEYALERA, SANJHBATIR RUPKATHARA,

Abstract
If we look at the prose written by authors who are famously known as poets, we will notice that their novels are directly or indirectly impacted by poetic essence. Here, I have discussed three novels by the eminent poet Joy Goswami. In these novels, there is plenty of evidence to support the fact that when a poet writes a piece of prose (here novel), there will be a poetic impact. It is somehow inevitable. These impacts can be found in the form of words, and sentences & sometimes also affect the syntax.
In the first novel, 'Seishob Sheyalera' we can see a character named Rajat Sen, who is a professor by profession. This character has very unique characteristics, he is silent, and always looks sad because deep down inside he is a sad person for many reasons. His presence in the poem always brings a vibe of loneliness and gloom. The poet draws this character as a form of an idea that can be related to poetry.
The next novel is 'Sanjhbatir Rupkathara'. In this novel, Joy Goswami created a fantastic lyrical ambiance through his prose. It is more like a poem than a novel. His selection of words and drawings of the characters are literally poetic.
The last novel is 'Pretpurush'. The theme of this novel is really interesting. It says the primitive desire of humankind. The desire of leaving a mark in this world through his child. The narrator, who is anonymous, narrates his life, his pain, and his unfulfilled desire. Joy Goswami describes his desires in a very poetic manner. His usage of words, syntax, and formation of sentences are extremely poetic. If we go through his poem's we will observe a huge similarity between his poems & literature.
Through my work, I have tried my best to show how his inner poet makes a prominent mark on his novels. Sometimes it's so obvious that anyone can comprehend and sometimes it's so subdued that one needs to dive deep into his writings to understand the same.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ধারাকে লক্ষ্য করলে একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্র কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য এই সমস্ত রচনা ধারায় যাঁরা রচনাকার তাঁরা সবসময় একটি ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখেননি। যিনি কবি তিনি কখনও ছোটগল্পকার, আবার যিনি নাট্যকার তিনিই আবার অসামান্য ঔপন্যাসিক। আবার ঔপন্যাসিক নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন কবিতার মধ্যে। এই বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করতে গিয়ে দুটি পৃথক ধারার মধ্যে কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থেকে গিয়েছে। এই যোগসুত্রের পেছনে রচনাকারের অন্তরের ভাবনা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, ধীশক্তির পরিচয় যেমন একদিকে ধরা পড়ে অন্যদিকে তাঁর রচনার মধ্যেও প্রকাশ পায় এক অনবদ্য ও সূক্ষ্ম মিশ্রণ। অর্থাৎ কবিতার মধ্যে ধরা থাকে গল্পকথনের ভঙ্গি আবার উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে কবিতার অনুষঙ্গ, কবিতার ভাবনা অনেকসময় কবিতার সুপ্ত সম্ভাবনাও।

আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক একটি ক্ষেত্র এখানে নির্বাচিত; কবি যখন গদ্য, আরও নির্দিষ্ট করে বললে উপন্যাস রচনা করেন তখন তাঁর রচনার মধ্যে থেকে যায় কবি-সত্ত্বার প্রভাব। এই বিষয়টিকে বিভিন্ন কবির উপন্যাসের নীরিখে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়ে। গদ্যরচনার ক্ষেত্রটি পদ্য রচনার ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা এই বিবিধ ক্ষেত্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করেই সাহিত্যকার রচনা করেন কাব্য-উপন্যাস-নাটক। কিন্তু নির্দিষ্ট রীতির বাইরেও লেখক হৃদয় বিচরণ করে। সেই ভাব থেকেই গদ্য-পদ্য-নাটক এইসব আলাদা পরিসরগুলো পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবপুষ্ট রচনার নামও বাংলা সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে – কাব্যপন্যাস, নাট্যকাব্য ইত্যাদি।

কবি জয় গোস্বামী একজন প্রথিতযশা কবি। তাঁর কাব্যরচনার উপস্থাপন ভঙ্গী থেকে শুরু করে বক্তব্যের বিস্তার, ভাষার ব্যবহার, ছন্দের প্রয়োগ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কবিসত্ত্বাকে আমরা খুব স্পষ্ট আর বলিষ্ঠভাবে দেখতে পাই। তাঁর কবিসত্ত্বার এই স্বচ্ছ প্রকাশ প্রভাবিত করেছে তাঁর উপন্যাসকেও। তিনি উপন্যাসে যেভাবে শব্দ, যতিচিহ্ন, রূপকের প্রয়োগ করেছেন সেগুলো অনুধাবন করলে বোঝা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন কবি আর তাঁর কাব্যের আভায় আলোকিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসেরা।

জয় গোস্বামীর উপন্যাসগুলিকে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে তাঁর কবিচেতনার প্রভাব উপন্যাসগুলিতে ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা 'সেইসব শেয়ালেরা', 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' ও 'প্রেতপুরুষ'। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে কখনও চরিত্র বুননে, কখনও ভাষার ব্যবহারে আবার কখনও বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে জয় গোস্বামীর কাব্যভাবনা। আলোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

'সেইসব শেয়ালেরা' (১৯৯৪) উপন্যাসটি জয় গোস্বামীর লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রে আছে একটি বিশেষ ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের চরিত্রদের গতিপ্রকৃতি ধরা পড়েছে। এক উন্মাদের অভিশাপ আর সেই অভিশাপের কথাগুলি পরপর মিলতে মিলতে এক পরিবারের বুকে নেমে আসে ধ্বংসের অন্ধকার। বিষয়টি নেহাতই কাকতালীয় বলে মনে হলেও অদ্ভুত এক অপার্থিব রহস্যময়তার মোড়কে সেটি ঢাকা আছে। পরিবারটির ট্র্যাজেডি অভিশাপের কথাগুলিকে কিছুতেই নেহাত কথার কথাতে আটকে রাখেনি, তাকে সত্যি করে তুলেছে। সেই সত্যের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। আছে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে তার উপস্থিতি। চেনা ছকের গণ্ডীকে তাই এই উপন্যাস ছাপিয়ে গিয়েছে।

উপন্যাসের গঠনের মধ্যে অনন্য ধারা চোখে পড়ে। একটি অধ্যায় উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বাবলু সেন-এর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে আবার ঠিক পরবর্তী অধ্যায়টিই ঔপন্যাসিকের ধারাভাষ্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে। এভাবে দুটি পৃথক ধারায় উপন্যাসটি এগিয়ে চলেছে। এই গঠনখানি উপন্যাসের বহু পরিচিত গঠনের মধ্যে পড়ে না। কবি জয় গোস্বামী এই দ্বিবিধ কথনভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করে এক অনন্য রীতির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছেন।

উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে আমরা যাব না। তবে এখানে যে চরিত্রটি অদ্ভুত কাব্যময় দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন সেটি হল রজত সেন-এর চরিত্র। এই উপন্যাসের এক দীর্ঘ পরিসর জুড়ে আছেন রজত সেন, বাবলু সেন-এর বাবা। এই চরিত্রটিকে ঘিরে এক অদ্ভুত মায়া, স্নেহ বিস্তার লাভ করেছে। রজত সেন এক অমায়িক চরিত্র। তার মুখের মধ্যে অদ্ভুত এক বিষন্ন সৌন্দর্য, "রজত সেনের মুখে আছে অপরূপ এক দুঃখীর লাবণ্য। চোখদুটো সব সময় অনেক দূরে কথাও তাকিয়ে থাকে।"[১] কিন্তু রজত সেনকে কখনোই ট্র্যাজিক হিরো বলে মনে হয় না। রজত সেন আসলে একটা আইডিয়া, একটা ভাবনার মূর্ত প্রতীক। আর এখানেই কবির কাব্যভাবনার যোগসূত্র ধরা পড়েছে।

উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে ওঠানামা থাকে, মানবিক গুণাবলী সেই চরিত্রকে আরও বেশি বাস্তবের কাছাকাছি করে তোলে। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে 'মধুসূদন'কে দেখা যায়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের এক এবং একমাত্র বাস্তবোচিত চরিত্র মধুসূদন কারণ তার মধ্যে... "ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে সব চাইতে সার্থক মধুসূদন। বিপ্রদাস, কুমুদিনী এবং মধুসূদন-এই ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের মধ্যে মধুসূদনই উজ্জ্বলতম।"[২]

'সেইসব শেয়ালেরা' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রজত সেনের চরিত্রের মধ্যে এক অদ্ভুত বিষাদ মাখানো আছে। এই বিষাদের প্রবাহ পুরো উপন্যাস জুড়েই রজত সেনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। তার চরিত্রের এই একস্তরীয় উপস্থাপনা তাকে বাস্তবচিত চরিত্রের থেকে অনেক বেশি আইডিয়াধর্মী বা একটু অন্যভাষায় বললে অনেক বেশি কাব্যময় করে তুলেছে। ঠিক যেন এক বিষাদ মাখানো কবিতার পাঠ করি আমরা যখন রজত সেনের চরিত্রকে উপন্যাসে দেখি। রজত সেনের সম্বন্ধে প্রথম বর্ণনার মধ্যেই ধরা আছে কবিতার ভাব, শব্দের ব্যবহারে ও বাক্যের গঠনে সেই কাব্যভাবনার প্রকাশ তো ঘটেইছে, পাশাপাশি দেখা দিয়েছে তার একঘেয়ে জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি যেটি বারবার ঘুরে ফিরে আসবে উপন্যাস জুড়ে, "রজত সেন মন খারাপ থাকলে অঙ্ক করেন। রজত সেন মন ভালো থাকলে অঙ্ক করেন। রজত সেন ছুটি থাকলে বাড়িতে বসে অঙ্ক করেন। ছুটি না থাকলে ক্লাসে গিয়ে অঙ্ক করেন। রজত সেন প্রবল বর্ষার দিনে বাড়িতে খিচুড়ি করতে বলেন। এবং অঙ্ক করেন। কখন বা খিচুড়ি করতে বলবেন বলে ভাবেন, শেষ পর্যন্ত বলেন না, কিন্তু অঙ্ক করেন।"[৩]

অঙ্কের শিক্ষক রজত সেন জীবনের অঙ্ক কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পারেননি যদিও। জীবনের অঙ্ক কষতে গিয়ে রজত সেন বারবার পর্যুদস্ত হয়েছেন। তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে এক অভিশাপের বিভীষিকা। সেই অভিশাপ অনেকটা নিয়তির মত রজত সেনের জীবনকে বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই বিষয়টি বারবার ফিরে ফিরে এসেছে অনেক কবিতার গড়নের মতো। কবি যেমন কবিতার মধ্যে ছন্দের বাঁধনে বার বার কোনো এক বিশেষ ভাবনাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, ঠিক সেভাবেই। উপন্যাসের বাক্যগঠনের দিকে এবার আমরা মনোনিবেশ করব। জয় গোস্বামীর প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ছোটো ছোটো বাক্যে বক্তব্যের উপস্থাপনা। অন্বয়ের গঠনে সব উপন্যাসের মধ্যে এক অদ্ভুত সাম্য চোখে পড়ে। কবিতার গঠনের মধ্যে যে ছন্দোবদ্ধ রূপটি উঠে আসে সেটি মূলত তার শব্দ ও বাক্যের সজ্জার উপরে নির্ভরশীল। আর এই সজ্জা ছন্দের শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। জয় গোস্বামীর কবিতার মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য আছে। পাশাপাশি এই নির্দিষ্ট শাসন মেনে চলার বিষয়টি তাঁর লেখা গদ্যের মধ্যেও ধরা পড়ে। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে -

> "অঙ্ক মন ভাল রাখার উপায়। অঙ্কের বই লিখলে টাকা। অঙ্কের টিউশান করলে টাকা। অঙ্কের খাতা দেখলে টাকা। কোচিং-এ পড়ালেও টাকা। বেশি নয় হয়ত– তবু টাকা। কষ্টার্জিতও।"[৪]

উপন্যাসের এই অংশটির পাশাপাশি জয় গোস্বামীর কবিতার অংশ পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করছি যার মধ্যে দিয়ে শব্দ ব্যবহার ও অন্বয়ের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়বে –

"বস্তুপিণ্ড ক্ষয়শীল। মনপিণ্ড গা বমি গা বমি।
পরমুখেপেক্ষী দিন, অপরে নির্ভরশীল বেলা
বয়ে যায়, চেপে বসে, ঘন্টি মারে, পরিচিতদের
প্রভুদাস নাম নিয়ে সর্বজনসমক্ষে দাঁড়ায়
ক্রোধ। প্রতিশোধ। ক্রোধ–মধ্যখানে এক অস্ত্রহীন

ভ্যাবলা বসে থাকে, তার মুখ চাটে সোনার হরিণ..."[৫]

অনুপ্রাস অলঙ্কারের ব্যবহার তো খুব সরাসরিভাবে চোখে পড়ছে। তবে এর পাশাপাশি বাক্যগঠন ও পদসজ্জার দিকে নজর দিলেও বোঝা যায় উপন্যাস ও কবিতার গঠনের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব আছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে আসা যাক –

> "ঝোড়ো এক ঝলক হাওয়া এল। ঘর থেকে ইজি চেয়ারটা এনে বারান্দায় পেতে বসলেন রজত সেন। হাওয়ার দমকে দু-চারটে শুকনো পাতা আশে পাশের গাছ থেকে বারান্দায় এসে পড়ল। এক একটা পাতা ভেসে পাঁচিলের ওপারে চলে যাচ্ছে।
>
> অনুমান, এই যে সমুদ্র, সমুদ্রের ওপারে কি আছে, তা কি এপারের মানুষ জানত কখনো? অনুমান করেই তো সে প্রথম নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছিল? যদি জলের পরে, জলের পরে, জলেই পৃথিবী শেষ হয়ে যেত? কিন্তু তা তো হয়নি? মাতি তো পাওয়া গেছে? অন্য দেশ! সেই দেশ তো একসময় অনুমান ছিল। সবই তো অনুমান।"[৬]

এই অংশের পাশাপাশি রাখা যায় নিচের কবিতাংশটি –

> "কে শুয়ে আছে ওটা? আমি তো? শিয়রে অবনতা
> কে মহিলা অশ্রু মুছে নেন? হাত আমারই কপালে!
> একটি যুবক পাশে; আর উনি? বৈদ্য সম্ভবত।
> একটি মেয়েও, তার মুখ যেন সন্তানের মতো –
> কিন্তু এরা কে আমার? কী একটা ঘরের ভেতর
> সবকিছু নিভে আসছে, কিন্তু ওরা? মনে আসছে না"[৭]

বক্তব্যের সাদৃশ্য ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, শব্দসজ্জা, বাক্যগঠন এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় গদ্য ও পদ্য উভয় দিক থেকেই পরিষ্কার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে নির্মিত বক্তব্য, উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহারে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসার যে তরঙ্গ উঠেছে তার উপস্থিতি উপন্যাস ও কবিতায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

> "উঁচু উঁচু বাড়ি ... চারতলা, পাঁচতলা, দশতলা, নিচে রাস্তা ... রাস্তার দুধারে বাড়ি ... রাস্তার দুধারে দোকান, শাড়ির দোকান, মিষ্টির দোকান, ক্যাসেটের দোকান, চায়ের দোকান, দোকানের ওপর বাড়ি ... উঁচু উঁচু বাড়ি ... চারতলা, পাঁচতলা, দশতলা ... পিচের রাস্তা চলেছে, ... বেঁকে গেছে ... রাস্তার দুধারে ফুটপাত ... কোথাও কোনো লোক নেই ..."[৮]

সমস্ত চেনা ছকের বাক্যসজ্জার জায়গা থেকে জয় গোস্বামী সরে এসেছেন এখানে। আশ্চর্যের বিষয় এই অনন্য প্রয়োগ তিনি করেছেন গদ্যবন্ধে; এখানে উপন্যাসে। কবির হাতে গদ্যের এই পরীক্ষামূলক গঠন তাঁর ভেতরের কবিসত্ত্বাকেই প্রকাশিত করে।

আমাদের পরবর্তী উপন্যাস 'সাঁঝবাতির রূপকথারা'(১৯৯৮)। এই উপন্যাসের গড়নে কাব্যভাবের একট বড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটির শুরু ও শেষ একই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে,

> "সাঁঝবাতি। আমার নাম। সন্ধ্যে বেলায় জন্মেছিলাম বলে মা রেখেছিল। বাবা বলেছিল সন্ধ্যেবেলায় নাকি আলোর মতো জ্বলে উঠেছিলাম আমি। ছোট্ট দীপের মতো।"[৯]

উপন্যাসের শেষ হয়েছে একই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে। এই অনবদ্য উপস্থাপনায় উপন্যাসের কাহিনির সমাপ্তিরেখা কোথাও টানতে চাননি কবি–ঔপন্যাসিক, উপন্যাসটি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। ঠিক একই রকম উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ জয় গোস্বামীর প্রায় প্রবাদ হয়ে যাওয়া একটি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়; 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'। এই কবিতায় "বেণীমাধব' চরিত্রটির নামখানা কবি প্রায় মালার মত জড়িয়ে রেখেছে। আরেকটু অনুধাবন করলে বোঝা যায় কবিতার সমাপ্তি কবিতার শুরুতে পাঠকদের নিয়ে যায়। কবিতাটির শেষ কয়েকটি স্তবক ও শুরু দুটো পরপর নিচে উল্লেখ করা হল বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে তোলার জন্য –

> "আজ জুটেছে, কাল কী হবে? – কালের ঘরে শনি

আমি এখন এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি
তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই?
কমন হবে, আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?"
"বেণীমাধব, বেণীমাধব, তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহনবাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে ..."[১০]

কবিতার শেষ থেকে যদি আবার শুরুতে ফিরে যাওয়া যায় তাহলে কথাও রসভঙ্গ হয় না। নাম না জানা সেই মেয়েটির আর্তি, তার স্মৃতিচারণা ও বাস্তব জীবনের কঠিন কঠোর অবস্থার ছবিটি ও বেণীমাধবের প্রতি তার চিরন্তন অনুরাগ কবিতাটির মধ্যে 'বেণীমাধব' নামটিকে অবলম্বন করে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। কবিতাটিকে শেষ হতে দেয় না। ঠিক আলোচ্য উপন্যাসটির মত।

উপন্যাসটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় সবচেয়ে কাব্যময় বিষয়টি হল এর শুরু ও শেষ। উপন্যাসের শুরু হচ্ছে,

"সাঁঝবাতি। আমার নাম। সন্ধ্যেবেলায় জন্মেছিলাম বলে মা রেখেছিল।"[১১]

উপন্যাসের শেষটিও এই বাক্যগুলো দিয়েই। বিষয়টি অনবদ্য ও আদ্যন্ত কাব্যময়। কিন্তু কেন? আসলে কবিতা পাঠের পরেও পাঠকের অন্তরে সেই কবিতার ভাব, তার মর্মবস্তুর অনুরণন থেকে যায়। কবি আশ্চর্যভাবে সেই অনুরণনকে শব্দের জাল দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন এই উপন্যাসে। একই শব্দ ও বাক্যসজ্জায় যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে তা এই উপন্যাসের আরম্ভ ও সমাপ্তিকে একটি মালায় গেঁথে ফেলে - কাহিনীর সমাপ্তিতে পৌঁছে আমরা আবার চলে যাই শুরুতে। কাহিনীর অনুরণন চলতে থাকে। এই অনুরণন শুধু কাব্যিক নয়, বাক্য গঠনে গদ্যসজ্জার উপস্থাপনায় এটি মূর্ত।

উপন্যাসের চলনের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক এবার। প্রথমেই চোখে পড়ে বাক্য গঠনের পরিমিত সংহত রূপটি। ছোট ছোট বাক্য, কখনোও আবার একটি শব্দ একটি বাক্যের যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে এখানে।

"মায়ের সঙ্গে দুপুরে ট্রেনে বাড়ি ফিরছি। জানলার ধারে বসেছি। হু হু করে গাছপালা পিছনে সরে যাচ্ছে। ভেসে উঠেছে মাঠ। ... ভেসে উঠেছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন ধীরগতিতে একটা চক্কর মেরে। বর্গক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে পুকুর ফুটে আছে। বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছবির জন্য জমি ভাগ করা যেন।"[১২]

বাক্য গুলির দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এদের গঠন-স্বাতন্ত্র্য। কবিতার রচনায় ব্যাকরণের প্রাসঙ্গিকতা কবির মর্জিনির্ভর। গদ্য রচনায় কিন্তু বিষয়টি এত সহজভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। অর্থাৎ গদ্য বাক্যে ব্যাকরণগত ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি চোখ আকৃষ্ট হয় খুব সহজেই। কবিতায় সেরকম হয় না। কবিতা ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট অন্বয়ের ভারকে অনেক সময় গ্রহণ করতে পারেনা।

"বাংলা পদ্যে যদি দর্শন বা ব্যাকরণ চর্চা আরও বেশি হত তাহলে পদ্য সম্ভবত তার ভার বহন করতে পারত না।"[১৩]

জয় গোস্বামী ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহারে একদিকে যেমন কাহিনিকে সরল উপস্থাপনার পথে চালিত করেছেন পাশাপাশি তাঁর অন্তরের কবিসত্ত্বাটিও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

"একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশ একত্রিত।"[১৪]

জয় গোস্বামী কবি; তাঁর প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ কবিতার মধ্যেই সেই কবি যখন উপন্যাস রচনা করছেন তখন তার কবি প্রতিভার রেশ অবশ্যই উপন্যাসকে আলোকিত করে তুলবে এ কথা বলার অপেক্ষায় রাখে না।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীটির দিকে একবার ফিরে দেখা যাক। উপন্যাসের কাছে সবচেয়ে বড় যে প্রত্যাশা থাকে তা হল মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সমাজের ও সময়ের প্রক্ষেপ উপন্যাসে থাকবেই, অন্তত সার্থক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয়। জীবন জিজ্ঞাসার বিষয়টি উপন্যাসকে অন্যান্য সমস্ত সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে আলাদা করেছে।

"মানুষের জীবনের গল্প শুনবার উৎসাহ থেকেই উপন্যাসের জন্ম।"[১৫]

'সাঁঝবাতির রূপকথারা' উপন্যাসে মানুষের জীবনের গল্প উঠে এসেছে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র সাঁঝবাতির জীবনের গল্পটি স্বচ্ছ সহজভাবে কবি উপস্থাপিত করেন। পাশাপাশি সাঁঝবাতির জীবনযাত্রায় যে ওঠাপড়া, অবসাদ-আনন্দ-বেদনা-প্রাপ্তি সবটাই উন্মোচিত করতে করতে উপন্যাসটি এগিয়ে চলে। অতএব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সাঁঝবাতির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সেই বিকাশের সমান্তরাল পথে মানব জীবনের কাহিনী তুলে ধরতে এই উপন্যাসটি কোনোভাবেই ব্যর্থ হয়নি।

উপন্যাসের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তার বাস্তবতা বোধ ও পাঠক হৃদয়ের সঙ্গে যোগ স্থাপন। উপন্যাসে এ বিষয় দুটি সাঁঝবাতির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সার্থকভাবে উঠে এসেছে।

সাঁঝবাতি তার নামটি পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। ছোট সংসার, বাবা চিত্র শিল্পী। সাঁঝবাতির সঙ্গী 'কাঁসা-পিতলের পূজারিণী।' একটি লণ্ঠন। এই লণ্ঠনটিকে ঘিরে সাঁঝবাতির গভীর গোপন কথাগুলি পাঠকের সামনে উঠে আসে; কখনোও তার হৃদয়ের দোলাচলতা, কখনোও আবার আঘাতের যন্ত্রণা, কখনোও বা প্রাপ্তির প্রশান্তি- সাঁঝবাতির জীবন পথে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ প্রকাশিত হয়েছে পূজারিণী সামনে। আসলে সাঁঝবাতির অপর একটি সত্ত্বা পূজারিণী - আত্মকথনের রীতিকে অনুসরণ করে সাঁঝবাতির অন্তরের কথাগুলো পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক। চরিত্রটির বহুমাত্রিক রূপটি ধরা পড়েছে এখানে ও পাশাপাশি বাস্তব জীবনের ছোট ছোট ঘটনার টানা পোড়েন এর ছবিটির সঙ্গে পাঠকের সংযোগ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক -

> "সেদিনই সকালবেলা আমার বাড়ি ফেরার সময় সকলেই আপত্তি করেছিল। তা কখনও হয়! কালকেই মেয়ে অমন অসুস্থ ছিল, আজই কখনও ছাড়া যায়। কিন্তু আমি জেদ ধরে রইলাম। তাতে কী হয়েছে। দুপুরে একটু বমি হয়েছিল। বমি কি মানুষের হয় না। মাকে একটু একলা পেতে জড়িয়ে ধরলাম, প্লিজ মা, চলো। তোমার পায়ে পড়ি। বাড়ি চলো। বাবার কাছে চলো।"[১৬]

সাঁঝবাতির এই আর্তির মধ্যে দিয়ে সন্তান ও মায়ের চিরায়ত স্নেহ সম্পর্কে এর আভাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চরিত্রটি পাঠকের চেনা পরিসরে এসে দাঁড়ায়। আরও একটি জায়গায় যেখানে নন্দ জেঠু অস্থির সাঁঝবাতিকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন –

> "অতো অস্থির হচ্ছ কেন, টুকুন? মাথা একটু ঘুরে গিয়েছিল, ঠিকই। কিন্তু তা-ই বা হবে কেন? এবং হলে চিকিৎসা করতে হবে। সেটাই চলছে। তুমি শান্ত হয়ে বোসো আগে। এত বড় মেয়ে, একটুতেই এত উতলা হয়ে পড়লে চলবে কি করে?"[১৭]

নন্দজেঠুর এই স্বল্প শাসনে অভিমানে ঠোঁট কেঁপে ওঠে সাঁঝবাতির। চরিত্রের ছোট ছোট অনুভূতিগুলোই তো তাকে আরও বেশি জীবন্ত বাস্তবময় করে তোলে।

কাহিনির সূত্র ধরে এগিয়ে চললে দেখা যায় সাঁঝবাতির বহুদিনের যত্নে লালিত প্রেম রঙ্গন-এর চেহারায় তার সামনে উপস্থিত, কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হলেও সম্পূর্ণ হয় না। বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। রঙ্গনের সম্পর্ক সাঁঝবাতির প্রিয় বন্ধু কেয়ার সঙ্গে। বাস্তবের এই চূড়ান্ত আঘাত এক মুহূর্তে তার বহুদিনের গোপন ছবির সব রঙকে ধুয়ে দিয়ে যায়। এখানে বাস্তবতার সঙ্গে কিছুটা নাটকীয়তার মিশেলও হয়েছে।

সাঁঝবাতির সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কের রূপরেখাটি বহুস্তরীয়। ছোট থেকেই বাবা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। পূজারিণী লণ্ঠনটি তার আত্মকথনের গোপন সঙ্গী। তবে তার বাবা সব অনুভূতির সাথী। বাবা সাঁঝবাতিকে শিখিয়েছেন কল্পনা করতে, কল্পনার রঙকে তার বাবাই চিনতে শিখিয়েছেন। সেই বাবার সঙ্গে সাঁঝবাতির সম্পর্কের ডোরটি ছিন্ন হয়ে গেলো তার বাবা ও দীপুপিসির অবৈধ সম্পর্কের সূত্র ধরে। এই ঘটনার সূত্র ধরে সাঁঝবাতি মাকে হারিয়ে ফেলে। একটি মধ্যবিত্ত সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পরিবারের এই ওঠানামার সঙ্গে পাঠকদের সংযোগ হতে বেশি সময় লাগে না। উপন্যাসের শেষে আমরা ব্যক্তিত্বময়ী দৃঢ়চেতা সাঁঝবাতিকে দেখি যে নিজের অনুভূতি, নিজের বেদনা-যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে।

উপন্যাসের এই দীর্ঘ পরিসরে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে গ্রথিত হয়েছে। এবার এই উপন্যাসের মধ্যে কাব্যময়তার জায়গাটি একবার বিচার করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে উপন্যাসের শুরু ও শেষ এক অদ্ভুত কাব্যধর্মী দ্যোতনায় উপস্থাপিত। এবার উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে কবিতার লক্ষণ কীভাবে ঢুকে পড়েছে কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে তা দেখানো প্রয়োজন।

বাবার আঁকা ছবির বর্ণনায়, সাঁঝবাতির সঙ্গে কথোপকথনে ধরা পড়েছে কবিতার লক্ষণ –

> "সেবার বৃষ্টির যত ছবি এঁকেছিল বাবা, সবটাই আনন্দের। মস্ত একটা আকাশকে একটা ছাতা ভেসে বেড়াচ্ছে। কিংবা একটা ছবির সমস্তটাই ঘিরে অজস্র পাতা। পাতা থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে নিচে।" [১৮]

> "বাবা বলে, কেউ এঁকেছে। বছরের পর বছর ধরে, হাজার হাজার মাইল ধরে কেউ এসব এঁকে গিয়েছে। এঁকে চলেছে এখনও। তাই না এত বদলে যায় সব। কী বদলে যায় বাবা! কেন আকাশ! যে আকাশ আমরা চোখ মেলে দেখতে পাই সে কি একরকম থাকে! না থাকে না তো? তার রং পাল্টে পাল্টে যায়।"[১৯]

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে কখনো প্রকৃতির বর্ণনায় কখনো মানবহৃদয়ের অনুভূতির রেখচিত্রকে গদ্যবন্ধের মধ্যে কবি ধরে ফেলেছেন -

> "আমরা জানলার ধারে বীজ লাগিয়ে বসে রইলাম। ... আমি চলে যাচ্ছি সেই জানলাটা সঙ্গে। বৃষ্টির সেই জানলা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমার বাড়ি থেকে দূরে, দেখতে দেখতে গুনগুন শব্দে বৃষ্টি শব্দ আবছা হলো একটু... নীচে তাকালে জল, জলের ওপরে আলো, একটা দুটো তিনটে, জানলাটা আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে একটা সেতু পেরিয়ে ..."[২০]

অনুভূতির এই চলন কাব্যরসে আর্দ্র। জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকতে বসে কবি কখন যেন তার কাব্যভাবকে মিশিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসে।

> "যে উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের চেয়ে বর্ণনা-পদ্ধতিকে মুখ্য স্থান দেয় এবং এই বর্ণনা রীতিকে লাবণ্যমণ্ডিত করার জন্য কবিতাসুলভ ভাব ও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভাষায় দূরবগাহ ইঙ্গিতময়তার একটি গুঢ় ব্যঞ্জনা থাকে তাকে চেনা যায় কাব্যধর্মী উপন্যাস বলে।"[২১]

আমাদের আলোচিত উপন্যাসটি কাব্যোপন্যাস; একথা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য আমার নয়। তবে উপন্যাসে পরিসরে অবগাহন করলেই বোঝা যায় কবি এখানে এক ধরনের 'কাব্যিক পরিবেশের আশ্রয়' নিয়েছেন যা উপন্যাসের মূল ধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এ কথা শেষ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা হয় না, কবির হাতে লেখা উপন্যাসের মধ্যে কবিতার ভাবটি থেকে যায়। সেই ভাব বর্ণনায়, বাক্যগঠনে, চরিত্রের বুননে, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পরবর্তী উপন্যাসের নাম 'প্রেতপুরুষ' (২০০৪)। এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য এক চিরন্তন সত্যের মধ্যে নিহিত। মানুষ তার অস্তিত্বকে জন্ম-মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে অপত্যের জন্ম দেয়। তার চিরায়ত অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছা তাকে প্ররোচিত করে বীজ বপনের। এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই লেখা হয় 'প্রেতপুরুষ' উপন্যাসটি। কাহিনির মুখ্য চরিত্র তাঁর অপূর্ণ ও অসুখী দাম্পত্য নিয়ে প্রতিনিয়ত বিষাদের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। এই চরিত্রটির মধ্যে উপন্যাসের চরিত্রগত সে সব বৈশিষ্ট্য তার প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। প্রেমহীন, স্নেহহীন এই চরিত্রটির শুধু একটি বাসনাই তাকে চালিত করেছে আর অন্য কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই ভাবনার মধ্যে কিছুতা আত্মকেন্দ্রিকতার বোধ কাজ করে। পাশাপাশি শুধু নিজের সঙ্গে নিজের আবেগ ভালোবাসার অনুভূতিও এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে – এই বিষয়টি উপন্যাসটিকে কাব্যময় করে তুলেছে একথা মানতে দ্বিধা নেই চরিত্রের মধ্যে একটি আইডিয়ার উপস্থাপনা ও তাকে সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে লালন করে চলা– এই ধারণার অবস্থিতি উপন্যাসে খুব একটা চোখে পড়ে না। জয় গোস্বামী অবলীলায় এই বিষয়টিকে শুধু আলোচ্য উপন্যাসেই নয়, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায়।

আলচ্য উপন্যাসের নায়ক প্রথম থেকেই বিমর্ষ, বিমর্ষ কারণ তার শরীরের অনুভূতি, বীজ বপনের ইচ্ছা শেষ হয়ে গিয়েছে। এই সত্যের মুখমুখি হয়ে তিনি অর্ধমৃত প্রেতের মতন সমস্ত উপন্যাসে এগিয়ে চলেছেন, উপন্যাসের শুরু বেশ চমকপ্রদ ও একই সঙ্গে কবিতার ভাবকে উদ্রেক করে।

> "সে কিছুকাল হল চলে গেছে। সে মানে যৌনশক্তি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তার আর দেখা মেলে না। এই যে সে চলে গেছে, এর জন্য কি আমার বিপুল কোনো অসুবিধা হচ্ছে? ... বিরহে? বিরহ? এই বিরহ ব্যাপারটা অনেকটাই তো তার দেওয়া। সে যখন ছিলনা, বিরহ ছিল কোথায়!"[২২]

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে উপন্যাসের মূল ভাবনাটি এই অংশে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা আছে। তবে অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে, সেইটি হল শব্দের প্রয়োগ ও তাদের ঘিরে তৈরী হওয়া ব্যঞ্জনা। একই শব্দের একাধিক প্রয়োগ পাঠকের হৃদয় ও মনকে নির্দিষ্ট একটি পথে চালিত করেছে। 'বিরহ' এই শব্দটির বার বার প্রয়োগে একদিকে অনুপ্রাস অলঙ্কারের অবতারণা যেমন দেখা যায় অন্যদিকে উপন্যাসের কেন্দ্রাভিগ আর্তি; অপত্য সৃষ্টির সেই চিরাচরিত আর্তির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানেই উপন্যাসের শরীরে কবিতার অলঙ্কার সজ্জিত হয়েছে, এই উপন্যাসের আরও বেশ কিছু অংশ উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইয়ে উঠবে –

> "আমি রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় সেই স্বাধীনতা পাই। আমি বৃষ্টির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সেই স্বাধীনতা পাই। পাই, অনেক লোকের সঙ্গে বাসে ঠেলে উঠে। পাই, অনেক লোকের সঙ্গে দৌড়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে, শেডের তলায় দাঁড়িয়ে। আমি যেন ধরে থাকতে পারি এই শহরের হাত। ওঃ বড় কষ্ট গেছে এতদিন।"[২৩]

স্পষ্ট অনুপ্রাস অলঙ্কারের উপস্থিতির পাশাপাশি বাক্য গঠনের দিকেও চোখ পড়ে পাঠকের। এই শব্দসজ্জার পুনরাবৃত্তি পাঠকের অনুভূতিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনে। কবিতার মধ্যেও এই ভাবটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আরোও একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক –

> "সেদিন শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পর একটা স্বপ্ন দেখলাম।
> প্রথমে একটা আওয়াজ। খটাস, ঠক। খটটাস। ট্রিক। ঠিক। আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি যেন একটা জানলায় দাঁড়িয়েছি এসে। জানলার নীচে শিউলি গাছ। বড় গাছ। একটা দুটো তিনটে গাছ। ও, এই তাহলে শিউলির জঙ্গল। অন্য কোনও গাছ এখানে হয় না। শিউলির পর শিউলি গাছ। ছোট বড় চারা সব গাছ। আর মাটিতে চারিদিকে শিউলি ঝরে সাদা হয়ে আছে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বড় একটা ক্যারাম বোর্ড। ঘুঁটি, স্ট্রাইকার সব স্থির। তবু সেই শব্দ খটাস খট। ঠকাস। ট্রিক। টুপটাপ করে শিউলি ঝরে পড়ছে ক্যারাম বোর্ডের ওপর।"[২৪]

এই স্বপ্ন দর্শনের বর্ণনার মধ্যে আদ্যন্ত কাব্য ব্যঞ্জনাকে ধরে রেখেছেন কবি।

জয় গোস্বামীর উপন্যাস ও কবিতা ভিন্ন পথে এগিয়ে চললেও মাঝে মাঝে একে অন্যকে ছুঁয়ে যায়। উপন্যাসের গড়নে বক্তব্যে ও শব্দসজ্জায় বার বার বিষয়টি ধরা পড়েছে। কবির একটি কবিতার দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক –

> "স্পষ্ট তুমি হারালে আবার। আর মেঘ ভূমে পা রেখে দাঁড়ালে
> মম অন্ধকার। তার পানপাত্র, তার সুপ্ত চাঁদ -- সে-কি খারাপ না ভালো
> তুমি তো জানোই
> সকল অসাধ্য কৃচ্ছ্র সমস্ত সাধিত পথ – দুপক্ষেরই শুরু
> ভুরুমধ্য থেকে। ক্রোধ: চক্ষুহীণ, কর্ণহীণ। দুই সখা, দুই লঘু গুরু,
> দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-ই"[২৫]

এই কবিতাংশটির দিকে একটু লক্ষ্য করলেও বোঝা যায় উপন্যাসের শব্দসজ্জা ও কবিতার শব্দসজ্জার মধ্যে কতখানি মিল আছে। কবিতার নিজস্ব গড়নের মধ্যে ছন্দের নির্দিষ্ট একটা স্পন্দন থাকে। এই স্পন্দন তাকে গদ্যবাক্যের গঠনের থেকে আলাদা করে রাখে। কবির স্পর্শে এই পার্থক্য অনেক সময় ফিকে হয়ে যায়। 'প্রেতপুরুষ' উপন্যাস থেকে আরও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল –

> "দিনগুলি সব নীল রঙের। রাত্রিগুলি মেঘ রঙের। গাছেরা গাছের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। মানুষজনের কোনও রঙ আমি দেখতে পাই না। আমি কিছু কিছু লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। বন্ধ করে দিয়ে ডায়েরি ছাড়া কিছু লিখি না। ডায়েরিতে পাগল না হবার উপায় খুঁজতে চাই। এখনও পাইনি।"[২৬]

এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি জয় গোস্বামীর কবিতা 'এখানে তোমার মাটিদেশ' থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করা যাক –

> "এইসব গাছেদের পূর্বপুরুষের প্রাণ / তুমি স্পর্শ করেছিলে হাতে তুলে। বৈঁচি বাবলায় / জল বা আলোর ফোঁটা কতটা একাগ্র হয়ে পড়ে / শিষ থেকে শিষে যেতে পতঙ্গের কী গতি পাখায় / বনের কোন্ দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ আবির্ভূত।"[২৭]

উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে যে মিল লক্ষ্য করা যায় সেটি হল শব্দসজ্জার। একই শব্দের বার বার প্রয়োগে, ক্রিয়ার ব্যবহারে অদ্ভুত এক সাম্য চোখে পড়ে। এই বিষয়টিই কবির হাতে ধরা পড়েছে বার বার।

> "তারপর অনেক রাত্রে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, আমি এসে দাঁড়াই এই সমুদ্রের তীরে – আমার পায়ে ঢেউ দেয় জল – তখন মাথা তুলে আকাশের সবচেয়ে উঁচু তারাকে আমি বলি:
> সোনার মেয়ে তোমার জন্য, কেবল তোমার জন্যই জন্মেছিলাম আমি
> মাথার উপর থেকে হাজার হাজার ফুট সমুদ্র সরিয়ে
> একদিন আমি ভেসে এসেছিলাম কেবল তোমার জন্যই"[২৮]

এই একাকীত্বের বোধ ও প্রেয়সীকে পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই বিষয়টি 'প্রেতপুরুষ' উপন্যাসের মধ্যেও ধরা আছে। তবে একটু অন্যভাবে, এই উপন্যাসে প্রেম নয়, জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ নিজের চিহ্নকে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা সেটিই প্রেম হয়ে দেখা দিয়েছে। নিজের সঙ্গে প্রেম, নিজের সঙ্গে ভালোবাসা। কিন্তু সব ভালোবাসার তো আধার থাকে, সেই আধার পুরুষের কাছে নারী। এই বিষয়টি এখানে প্রেম হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা আইডিয়া এই উপন্যাসের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তাই লেখক শেষে বলেছেন,

> "আর সামনে তাকালে দেখা যায়, দূরে এক বালির চড়া যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রেত, এক অনন্তকাল সম্পূর্ণ হবার পর আবারও জন্মাবে ওই প্রেত আবারও এক প্রেতিনীকে খুঁজে আনবে, গেঁথে দেবে নিজের সঙ্গে – আবারও ভালোবাসবে না, পরস্পরকে আঁচড়ে ও কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবে ..."[২৯]

এই আদিম বন্য বাসনার মধ্যে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষার আর্তি আছে তা অত্যন্ত কাব্যময়। কবিতার ভাষাকে কেন্দ্র করে যে ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে, মূর্ততাকে অতিক্রম করে কবি যেভাবে বিমূর্ততার মধ্যে আমাদের নিয়ে যান, ঠিক সেভাবেই উপন্যাসের মধ্যেও কবি এই বিমূর্ততার ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যে তিনটি উপন্যাসের আলোচনা এখানে করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। তিনটি উপন্যাসে তিনজন পুরুষ চরিত্রকে আমরা পেয়েছি যাদের মধ্যে অদ্ভুত এক মিল আছে। তাদের বিষাদময় জীবন ও সেই বিষাদময় অবস্থার মধ্যে থেকে ধীর পদে তাদের এগিয়ে চলজ, চলতেই থাকা। এই অনন্তের দিকে এগিয়ে চলার মধ্যে কবি এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় আবহের সৃষ্টি করেছেন। তিনজন পুরুষ তিনটি উপন্যাসের চরিত্রের গণ্ডিকে ছাপিয়ে একটা আইডিয়াকে জন্ম দিয়েছে। সেই আইডিয়া আসলে কাব্যময় এক বিমূর্ত ভাবনা, যাকে অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব। উপন্যাসের চিরাচরিত কাঠামোয় এই আইডিয়াকে ধরা যাবে না। এই কারনেই ঔপন্যাসিক জয় গোস্বামী কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এক পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. গোস্বামী, জয়, ১৯৯৪, সেইসব শেয়ালেরা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৬
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ১৩৫৩ বং, কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, বাক-সাহিত্য, কলকাতা, পৃ. ১৬০
৩. গোস্বামী, জয়, ১৯৯৪, সেইসব শেয়ালেরা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৬
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, প্রলাপলিখন, আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৭
৬. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৪, সেইসব শেয়ালেরা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৫
৭. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, জাতিস্মর, পাগলী, তোমার সঙ্গে, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৩২
৮. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৪, সেইসব শেয়ালেরা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১০১

৯. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৮, সাঁঝবাতির রূপকথারা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৭
১০. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়, আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ২২
১১. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৮, সাঁঝবাতির রূপকথারা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৭
১২. তদেব, পৃ. ৫১
১৩. দাশ, শিশিরকুমার। ১৩৯২ বং, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৪
১৪. দাশ, জীবনানন্দ। ১৩৪৫ বং, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ১১
১৫. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। ১৪০২ বং, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১৬
১৬. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৪, সাঁঝবাতির রূপকথারা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৫০
১৭. তদেব, পৃ. ৯৯
১৮. তদেব, পৃ. ৪৭
১৯. তদেব, পৃ. ৫৭
২০. তদেব, পৃ. ৮৭
২১. রায়, অলোক সম্পাদিত। ১৯৬৭,সাহিত্য কোষ: কথা সাহিত্য, কাব্যধর্মী উপন্যাস- বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৫৬
২২. গোস্বামী, জয়। ২০০৪, প্রেতপুরুষ ও অনুপম কথা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১১
২৩. তদেব, পৃ. ১৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৬
২৫. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, নমস্তসৈ, গোল্লা, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৯৩
২৬. গোস্বামী, জয়। ২০০৪, প্রেতপুরুষ ও অনুপম কথা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৭৭
২৭. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, এখানে তোমার মাটিদেশ, বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ২০৫
২৮. গোস্বামী, জয়। ১৯৯৭, সবচেয়ে উঁচু তারাকে আমি বলি, পাগলী, তোমার সঙ্গে, কবিতাসংগ্রহ ২, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৫৯
২৯. গোস্বামী, জয়। ২০০৪, প্রেতপুরুষ ও অনুপম কথা, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১২২